ই-বর্জ্যের ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজন জনসচেতনতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

উম্মে ফারুয়া

বর্তমান ডিজিটাল যুগে বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার অত্যন্ত উদ্বেগজনকহারে দ্রুত বাড়ছে; কিন্তু ব্যবহারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এগুলো যে পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ তৈরি করছে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা ও সচেতনতা অত্যন্ত সীমিত। অত্যধিক জনঘনত্বের এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ই-বর্জ্য একটা বড়ো ধরনের হুমকি হয়ে উঠছে, যা একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে তা তেমনি পরিবেশ সুরক্ষার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাই ই-বর্জ্য সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে এখন থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য বলতে পরিত্যক্ত বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বা পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি বোঝায়। এগুলি মূলত ভোক্তার বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, যেমন- ফ্রিজ, ক্যামেরা, মাইক্রোওয়েভ, কাপড়ধোয়ার ও শুকানোর যন্ত্র, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ল্যাবটপ ইত্যাদি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নিয়মনীতিহীন ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ থেকে মানবস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এবং পরিবেশ দূষণ হতে পারে। এসব যন্ত্রপাতিতে মানবস্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য অনেক ক্ষতিকর উপাদান থাকে। সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়াম, লিড অক্সাইড প্রভৃতি ধাতব ও রাসায়নিক উপাদান মানুষের স্নায়ুতন্ত্র, যকৃৎ, বৃক্ক, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, ত্বক ইত্যাদির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব ই-বর্জ্যের মধ্যে সিসা, সিলিকন, টিন, ক্যাডমিয়াম, পারদ, দস্তা, ক্রোমিয়াম, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদান থাকে এবং এসব রাসায়নিক পদার্থ দেশের মাটি ও পানিকে দূষিত করছে। মাটির গুণগতমান নষ্ট করছে, শহরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। নানাভাবে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে নানারোগের ঝুঁকি তৈরি করছে। বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুদের ঝুঁকি বেশি। ই-বর্জ্যের সিসা নবজাতকের স্নায়ুতন্ত্রে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। শিশু বড়ো হলে ফুসফুস, শ্বাসতন্ত্র, থাইরয়েড জটিলতা, ক্যানসার ও হৃদরোগের মতো বড়ো রোগের জটিলতায় পড়ে। তাই ই-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি ই-বর্জ্য ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে একটি বৈশ্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৫ জুন ২০২১ প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে ই-বর্জ্য থেকে কার্যকর ও বাধ্যতামূলকভাবে শিশুদের রক্ষা করতে আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ই-বর্জ্যের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ শিশু, কিশোর ও কিশোরী এবং গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদের রক্ষা করতে হলে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে গত ১০ বছরে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে ৩০ থেকে ৪০ গুণ। পরিবেশ অধিদপ্তর ২০১৮ সালে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল এবং এতে বলা হয়, ওই বছর দেশে ৪ লাখ টন বৈদ্যুতিক ইলেকট্রনিকস বর্জ্য জমা হয়। এর মধ্যে কেবল ৩ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বা রিসাইক্লিং শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বাকি ৯৭ শতাংশের ঠাঁই হয় ভাগাড়ে। এতে আরও বলা হয়, দেশে প্রতিবছর ২০ শতাংশ হারে ই-বর্জ্য বাড়ছে এবং ২০৩৫ সাল নাগাদ এই ই-বর্জ্য বছরে ৪৬ লাখ টনে দাঁড়াবে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তথ্য মতে, '২০১৬ সালে ১ লাখ ৪২ হাজার মেট্রিক টন ই-বর্জ্য বের হয়েছে। ২০২১ সালে ১ হাজার ১৬৯দশমিক ৯৮ টন মোবাইল ই-বর্জ্য বের হবে। ই-বর্জ্য শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই বড়ো উদ্বেগের কারণ এগুলো একদিকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ করছে। ই-বর্জ্য নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক জোট গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট স্ট্যাটিসটিকস পার্টনারশিপের (জিইএসপি) এক হিসেবে বলছে, বিশ্বে প্রতি পাঁচ বছরে ই-বর্জ্য ২১ শতাংশ হারে বাড়ে। ২০১৯ সালে সারা পৃথিবীতে ৫ হাজার ৩৬০ কোটি কেজি ই-বর্জ্য জমা হয়। সে বছর মোট উৎপাদিত ই-বর্জ্যের শুধু ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে। ই-বর্জ্য বেশি জমা হচ্ছে নিম্ন আয় ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে, বিশ্বে ১ কোটি ২৯ লাখ নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্যখাতে নিয়োজিত। এ সমস্ত নারী ও তাঁদের অনাগত সন্তানদের বিষাক্ত ই-বর্জ্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। পাশাপাশি অন্তত ১ কোটি ৮০ লাখ শিশু ও কিশোরের একটা বড়ো অংশের বয়স পাঁচ বছরের নীচে, যারা সক্রিয়ভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতের সঙ্গে যুক্ত আছে। সংস্থাটি আরও বলছে, অভিভাবকেরা প্রায়ই শিশুদের ই-বর্জ্য খেলতে দেন ও পুনর্ব্যবহার কাজে লাগান। ঘরের মধ্যে শিশুরা এগুলো খেলনা হিসেবে ব্যবহার করে। ই-বর্জ্যের বিষাক্ত রাসায়নিক, বিশেষ করে মার্কারি এবং সিসা উচ্চমাত্রায় থাকে। এসব ক্ষতিকর পদার্থ খুব সহজেই শিশুর শরীরে প্রবেশ করে এবং এতে শিশুদের বুদ্ধি বিকাশের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ই-বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। প্রথমত, যন্ত্র ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি শেখা। এতে মোবাইল, ল্যাপটপ ও ট্যাব বেশি দিন ধরে ব্যবহার করা যাবে। গুরুত্ব দিতে হবে পুরোনো সামগ্রীর ব্যবহার বাড়ানোর

উপরে। একই যন্ত্র একাধিক কাজ করবে, এমন মাল্টিপারপাস ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের ব্যবহার বাড়াতে হবে। একই চার্জারে সব সংস্থার সব মডেলের মোবাইল চার্জ করা যায়, এমন চার্জারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ইউনিফর্মের ব্যবহার, নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে কিছুটা সুফল মিলবে। তাছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ই-বর্জ্য একটা বড়ো ধরনের সমস্যা ও হুমকি হয়ে উঠছে, যা সমাধানের লক্ষ্যে এখন থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ই-বর্জ্যের কারণে ঘটছে জলবায়ুর পরিবর্তন ও এটা বিশ্বব্যাপীই ঘটছে। এর জন্যও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ মোবাইল ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন দেশে ই-বর্জ্য রোধ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। নষ্ট মোবাইল ফোন ফেরত দিলে যাতে ফোনের মালিক কিছু টাকা পান, এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে করে ই-বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলে না রেখে মানুষ তা নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) এবং মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ‘ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন করেছে। এ বিধিমালার আওতায় ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য থেকে সৃষ্ট বর্জ্য বা ই-বর্জ্য উৎপাদনকারী বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানকেই ফেরত নিতে হবে। পাশাপাশি ব্যবহারের পর নষ্ট বা বাতিল মোবাইল ফোন, ল্যাপটপসহ অন্যান্য ই-বর্জ্য ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ পাবেন ব্যবহারকারীরা, এ মর্মেও বিধিমালায় শর্ত আরোপ করা আছে। এমন শর্ত রেখেই এই বিধিমালার ফলে বিদেশ থেকে এখন আর কেউ পুরানো বা ব্যবহৃত মোবাইল বা ল্যাপটপ আনতে পারবেন না। বিধিমালার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করলে ‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০)’ এর ১৫ (১) ধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধের ক্ষেত্রে দুই থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড বা দুই থেকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড প্রদানের বিষয়ে বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিধিমালায় প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী ও বড়ো আমদানিকারকের ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিধিমালা বাস্তবায়নের প্রথম বছর প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী ও বড়ো আমদানিকারককে উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ১০ শতাংশ সংগ্রহ করতে হবে। দ্বিতীয় বছরে ২০ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ৩০ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ৪০ শতাংশ ও পঞ্চম বছরে ৫০ শতাংশ ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে বলেছেন, এর জন্য বিজনেস প্ল্যান বা ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রয়োজন, যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায়। তাহলে এটা আর ঝুঁকিপূর্ণ থাকবে না। তার মতে, বর্তমান সময়ে ই-বর্জ্য কমানো যাবে না, আমাদের ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল পণ্যের ব্যবহার আরো বাড়বে। পুরোনো প্রযুক্তি বাদ দিয়ে নতুন প্রযুক্তিতে যেতে হবে। পাশাপাশি এ সংশ্লিষ্ট যথাযথ ব্যবস্থাপনাও করতে হবে।

নতুন স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ই-বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ নিরূপণের ব্যবস্থা; তারপর এগুলোর জন্য স্থায়ী ভাগাড় ও রিসাইক্লিং কারখানা স্থাপন করা। জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগও নিতে হবে। এ বিষয়ে ভারত, চীনসহ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে হবে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, ব্যবহার এবং ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইন-বিধান মেনে চলার ব্যবস্থা ও তদারকি করা। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে প্রায় ১৩ কোটি মানুষের হাতে মুঠোফোন; অন্যান্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এগুলোর প্রায় ৩০ শতাংশই প্রতিবছর ই-বর্জ্যে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে এনএইচ এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে জানা যায়, টেলিকম অপারেটর থেকে বছরে প্রায় ১ হাজার টন ই-বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। এখানে সীমিত পরিসরে ভাঙাড়ি ব্যাবসায়ীদের দিয়ে পুরোনো হ্যান্ডসেট কিনে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা করা হয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও বড়ো আয়োজন করে এমন আরও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সরকারের পাশাপাশি সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত যত্রতত্র ই-বর্জ্য না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা এবং অপরকে ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দ্রুত পরিকল্পনা না নিলে আগামীতে এগুলো জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য ভয়ংকর ঝুঁকি তৈরি করবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

#

০৪.১১.২০২১ পিআইডি ফিচার